এই সময়
স ং বা দ প ত্র

ক থা স রি ৎ

যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে;
যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।
— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৈষম্য

অসহিষ্ণুতা একটি নতুন রূপে প্রকাশিত হল গুজরাটে। সে রাজ্যে আহমেদাবাদ সহ চারটি শহরের পৌর প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, পথে যাঁরা আমিষ খাবার বিক্রি করেন, তাঁদের শহরের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিতে হবে। গত মঙ্গলবারেই দেখা গিয়েছে, আহমেদাবাদের ১ লক্ষ ১০ হাজার পথখাদ্য-বিক্রেতাদের মধ্যে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার জনই অনুপস্থিত। এই পদক্ষেপ অন্যায্য দু'টি কারণে। প্রথম, স্পষ্টতই একটি নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস প্রশাসনের নিশানায়। অতএব সিদ্ধান্তটি বৈষম্যমূলক। দ্বিতীয়ত, এর ফলে এমন মানুষদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা অতিমারীর দরুণ এমনিতেই প্রবল আর্থিক দুর্দশায়। কেন এই পদক্ষেপ, তার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী কারণ শোনা গিয়েছে প্রশাসনের কাছে থেকে। কোনও কোনও আধিকারিক 'গন্ধ' এবং 'পরিচ্ছন্নতা'কে কারণ হিসেবে খাড়া করেছেন। অসহিষ্ণুতার ক্রমবর্ধমান তালিকায় 'গন্ধ' একটি নতুন সংযোজন বটে! পরিচ্ছন্নতা বা তার অভাবের জন্য শুধুমাত্র আমিষ পথখাদ্য-বিক্রেতাদের দায়ী করাটাও অযৌক্তিক। অতঃপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ কেউ জানিয়েছেন যে স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তির দরুণ এই পদক্ষেপ, যদিও সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তাঁর প্রশাসন খাদ্যাভ্যাসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। অবশেষে নবতম অজুহাতটি হল বেআইনি ভাবে রাস্তা দখল।

এ থেকেই বোঝা যায় যা কারণ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সেগুলি আসলে আমিষ খাদ্যবিক্রেতাদের সরিয়ে দেওয়ার অজুহাত মাত্র। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসবাণী কতটা আন্তরিক, তা নিয়েও সন্দেহের উদ্রেক সঙ্গত, কারণ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মপ্রণালী ঠিক তার বিপরীতমুখী। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, একই ধরনের ছবি দেখা গিয়েছিল বিজেপি-শাসিত হরিয়ানায়। উৎসবের মরশুমে কিছু শহরাঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসন মাংস বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যদিও রাজ্য সরকারের তরফে এমন কোনও নির্দেশ জারি করা হয়নি। এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে তা সামাজিক সুস্থিতি ও শান্তির নিরিখে উদ্বেগজনক। অন্য দিকে, এই পদক্ষেপে পথবিক্রেতাদের রুজি-রোজগারে টান পড়েছে। যখন কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সাহায্যের জন্য গত বছর বিশেষ ঋণদান প্রকল্প চালু করেছে, তার প্রেক্ষিতে গুজরাটে স্থানীয় প্রশাসনের এ ধরনের পদক্ষেপ বিস্ময়কর। বরং উচিত ছিল অতিমারীতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত এই ব্যবসায় নিয়োজিত মানুষদের জন্য বিশেষ সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা।

বিলুপ্তি

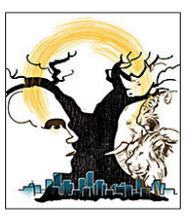

কিছুকাল আগে মালদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু'টি সোনালি শেয়ালের মৃত্যু হয়। প্রাথমিক অনুমান, গ্রামবাসীর পাতা ফাঁদেই তাদের প্রাণ গেছে। ফাঁদ পেতে বন্য প্রাণী হত্যার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে। কিছু দিন আগে ধানক্ষেত থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ মিলেছে। পাকা ফসল রক্ষার্থে ক্ষেতের সন্নিকটস্থ জলাশয়গুলিতে বিষ মিশিয়ে দেওয়ায় বহু পরিযায়ী পাখির বাসস্থান বরাবরের মতো ধ্বংস হয়েছে, বা এখন বন দপ্তরের দ্রুত হস্তক্ষেপে নিরাময়ের অপেক্ষায় সংকটাপন্ন অবস্থায়। অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনে মামলা করা যেতে পারে। তাতে একটি বিশেষ এলাকার জনাকতকের স্বল্পমেয়াদি কারাবাস নিশ্চিত করা গেলেও দীর্ঘমেয়াদি সুরাহার খোঁজ দিতে না পারলে এই ধ্বংসলীলা থামবে কি? শিল্পিরা নেউলের লোম থেকে তৈরি তুলি শিল্পকর্মে অপরিহার্য মনে করা না থামালে প্রাণীটি অচিরেই এই ভূখণ্ড থেকে বিলুপ্ত হতে পারে। চাষে পোকা মারার বিষ ছেটানো বন্ধ না হলে শকুনও উড়বে না আকাশে। কে কার জন্য ফাঁদ পাতছে, এবং শেষ পর্যন্ত কে ফাঁসছে সেটা মন দিয়ে ভাবা দরকার। রাসায়নিক সার প্রয়োগ মারফত এক দিন প্রাণিজগতটিকেও ফের বহুফসলি করে ফেলা যাবে কি? বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীদের বাঁচানোর জন্য এখনই কোমর বেঁধে নামা দরকার। নচেৎ খুব বেশি দেরি হয়ে যাবে না তো?

অ সং খ্যা

২৯৫০০০০০

(দু'কোটি পঁচানব্বই লক্ষ) ডলার — গত বছরের জুন মাস পর্যন্ত সব থেকে বেশি উপার্জন করেছে যে ইয়ুটিউবার, সেই ন'বছর বয়সি রায়ান কাজি-র ইয়ুটিউব থেকে বার্ষিক আয়। সূত্র: স্ট্যাটিস্টা ডট কম

দি ন কে দি ন

১৯ নভেম্বর

১৯১৭: ইন্দিরা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৭ আবার ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭১-এ পেয়েছেন ভারতরত্ন।

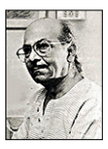

১৯২৩: সলিল চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। বাংলা, হিন্দি ও মালয়ালম ছবি ছাড়াও তিনি অসংখ্য চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

জগদ্‌গুরু

স্বামী সারদানন্দ

বো ধি বৃ ক্ষ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন— যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি প্রকৃত ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই। যখনই ভক্তি ও জ্ঞান-শিক্ষার জন্য আচার্যের প্রয়োজন হয়, তখনই তিনি আচার্যরূপে অবতীর্ণ হন। তিনিই যথার্থ গুরু এবং জগৎ তাঁকেই অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। তিনিই মায়ান্ধ ও বিষয়াসক্ত জীবের চোখ ফুটিয়ে দেন। একভাবে তিনিই সমস্ত জগদরূপে বিরাজিত, স্থাবর জঙ্গম যা কিছু দেখতে পাই সকলই তাঁর প্রতিকৃতি; অন্যভাবে তিনিই সমস্ত জীবজন্তুতে চৈতন্যস্বরূপে বর্তমান আছেন। আবার প্রকৃত ধর্ম ও শান্তিস্থাপন করবার জন্য তিনি জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি মনুষ্যশরীরে মায়ার অদীশ্বররূপে অবতীর্ণ হয়ে মায়াবশ জীবকে মুক্তির প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করেন। যুগে যুগে শরীর বিভিন্ন হলেও অবতার ভিন্ন ভিন্ন নন, একই। তিনিই প্রয়োজনানুসারে নানারূপে অবতীর্ণ হন। যখন যেরূপ ভাবের দরকার, তখন সেরূপ ভাবে অবতীর্ণ হয়ে তিনি লোকশিক্ষা দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে তিনি বহুবার অবতীর্ণ হয়ে বহু ভাব শিক্ষা দিয়ে গেছেন। এইজন্যই ভারতবর্ষ সকল জ্ঞানের আকার-স্বরূপ ছিল। যখনই আবশ্যক হয়েছে, তখনই তিনি ভারতবর্ষকে তুলেছেন। সেইজন্যই এখনও পদদলিত, অত্যাচারিত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে কত কত ধর্মবীর ও কর্মবীর আবির্ভূত হয়ে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। সেইজন্য আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত ধর্মক্ষেত্রে অন্যান্য দেশাপেক্ষা প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তির আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। ('গীতাতত্ত্ব ও ভারতে শক্তিপূজা' থেকে গৃহীত)

২০২১-এ তৃণমূলের একক দল হিসেবে যত ভোট, '৭২ বাদ দিলে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তা সর্বাধিক

রাজ্যের রাজনীতি কি এবার নতুন পথে এগোবে

পুরনো ধাঁচের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। ব্যক্তিগত কুৎসার রাজনীতি বন্ধ হোক। বন্ধ হোক উন্নয়নের কাজে অযথা বিরোধিতাও। লিখছেন **মইদুল ইসলাম**

কৌশিক রায়

নভেম্বর মাসের উপনির্বাচনগুলোর পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২৯৪ আসনের সমস্ত আসনের নির্বাচন সম্পূর্ণ হল। তৃণমূল জয়ের ব্যবধান বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী ইতিহাসে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস এই প্রথমবার কোনও আসন পেল না। এক পরিচালক এক সময় একটি ছবি বানিয়েছিলেন। 'শূন্য থেকে শুরু' (১৯৯৩)। ছবিটির মধ্যে নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার নতুন করে ভাবা এবং কাজ করার বার্তা ছিল। নবীন প্রজন্ম সেই ছবি দেখেছে কিনা জানি না। কারণ একটু অন্য নামের একটি বাংলা ছবি, 'শেষ থেকে শুরু' (২০১৮) আজকাল লোকে দেখছে। সেই ছবি আজ আরও অনেক বাংলা ছবির মতো টালিগঞ্জ পাড়ার আত্মজীবনীমূলক ধারার ছবি। পশ্চিমবঙ্গে খুব কম রাজনৈতিক ছবি হচ্ছে। কেন জানি না।

'শূন্য থেকে শুরু' ছবিটিতে নকশাল আন্দোলনের কমরেডদের মধ্যে রাগ, মান, অভিমানও ছিল। কেউ কেউ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভয়ে বিদেশে চলে গিয়ে ঠিক সুযোগ নিয়ে নিল আর কেউ কেউ বোকার মতো বসে জেলে ঢুকল। বামফ্রন্ট আমলের সময়ের সেই ছবি থেকে আজ বামফ্রন্টেরও অনেক শিক্ষা নেবার আছে। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে দুই উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের ভোট বেড়েছে। শুধু ভোটই বাড়েনি। শান্তিপুর কেন্দ্রে তারা বেশ ভালো ফল করেছে। লোকাল কমিটির পুনর্বিন্যাসের পরে যে এরিয়া কমিটি হয়েছে সেগুলি পাকাপোক্ত করে সংগঠন আরও বাড়বে কিনা তা অবশ্য আগামী পৌরসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে বোঝা যাবে।

বামফ্রন্টের অনেক নেতার হয়তো মনে আছে যে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ২০১১ সালের বিরাট জয়ের পরে বলেছিলেন যে সিপিআই(এম)-এর এখন দশ বছর মুখে সেলোটেপ মেরে বসে থাকা উচিত। দশ বছর অতিক্রম হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট নতুন করে বিভিন্ন বিষয়ে লড়াই-আন্দোলন করে, নতুন প্রজন্মের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে গেলে আগামী দিনে তাদের ভবিষ্যৎ আছে কিনা তা অবশ্য সময়ই বলবে। কিন্তু উপনির্বাচনে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল যে বিজেপির ভোট বামফ্রন্টের ঘরে আবার ফিরতে শুরু করেছে। অন্তত শান্তিপুর আর খড়দহ উপনির্বাচনে তাদের ভোট বৃদ্ধির ফল বিশ্লেষণ করলে তা বোঝা যায়। অন্য দিকে নভেম্বর মাসের উপনির্বাচনে চার আসনের মধ্যে তিনটে আসনে বিজেপির জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বামফ্রন্টের জন্য তা অবশ্যই সুখকর কারণ গত কয়েক বছরে রামের ভোট বামে গেছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল যা ভোট পেয়েছে, রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে একক পার্টি হিসেবে কোনও দল তা পায়নি। উপনির্বাচনের ফল যোগ করলে তা ১৯৭২ সালের ৪৯.০৮ শতাংশের ভোটকে ছাপিয়ে গেছে। তবে মনে রাখা দরকার যে ১৯৭২ সালের ভোটকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা তেমন গুরুত্ব দেন না, কারণ সেই ভোটে ব্যাপক রিগিং হয়েছিল। আগামী দিনে তৃণমূলের শক্তি আরও বাড়তে পারে যদি সরকারি প্রকল্পগুলো মানুষের কাছে ঠিকমতো পৌঁছয়। বামফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতা থেকেও তৃণমূলের অনেক শেখার আছে। বামফ্রন্ট দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছে কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপকতা এবং তার সঙ্গে পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং বিধানসভা নির্বাচন সময়মতো হত।

অনেকে ঠাট্টা করে বলেন বাঙালি নাকি সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে স্থায়িত্বের প্রতি যত্নবান। স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘস্থায়ী হবার প্রতি তাদের ঝোঁক। ১৯৪৭-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস। তার পর বাঙালি একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে গেছে ১৯৬৭-১৯৭৭, এই সময়পর্বে। তার পর আবার ১৯৭৭-২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালীন একটি শাসন। ২০১১ সাল থেকে আর একটি দীর্ঘমেয়াদি শাসনের দিকে পশ্চিমবঙ্গ এগোচ্ছে। কিন্তু স্থায়িত্ব বলে কিছু হয় না। রাজনীতি সদা পরিবর্তনশীল। রাজনীতির ইস্যুগুলো পর্যন্ত পরিবর্তনশীল। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ৪৭.৯৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনকে বাদ দিলে কোনও দল একক ভাবে এত ভোট পায়নি। ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট জমানায় সিপিআই(এম) ৩৯.৩০ শতাংশ ভোট পায়। সেটাই ছিল এই পার্টির সব থেকে বড় জয়। ক্ষমতায় থাকার দশ বছরের পর যদিও বামফ্রন্ট জমানায় সম্মিলিত শক্তি হিসেবে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনগুলোয় বামফ্রন্ট ৪৮ থেকে ৫২ শতাংশের মধ্যে ভোট পেয়ে গেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আসন সংখ্যাই শেষ কথা বলে। কিন্তু ভোটের শতাংশকে একদম উপেক্ষা করা যায় না। কারণ ভোটের শতাংশ বিচার করে দেয় ভবিষ্যতে একটি পার্টির সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা আছে কিনা।

এ দিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সংস্কৃতি আরও খারাপ হচ্ছে। নেতৃবৃন্দের ভাষা, খিস্তি-খেউড় থেকে শুরু করে বাজার গরম করার রীতি গত এক দশক ধরে চলছে। টেলিভিশন চ্যানেল-এর সৌজন্যে মানুষ আজ সেগুলিই প্রতিনিয়ত দেখছে। আগামী পৌরসভা নির্বাচনে যেন সেই একই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বজায় না থাকে। ইস্যুভিত্তিক রাজনৈতিক প্রচার হোক। ব্যক্তিগত আক্রমণ, ব্যক্তিগত কুৎসা ও ব্যক্তিগত জীবনের যে সব ধারাবিবরণী দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সামাজিক মাধ্যম ও টেলিভিশনের পর্দায় নিত্যদিন প্রচারিত হয় তা শুধু অস্বাস্থ্যকর নয়, তাতে রাজ্যেরও ক্ষতি। পাবলিক গালিগালাজ দেখলে খুশি হয় বলে রাজনীতিবিদরা তাই করবেন? তা হলে রাজ্যের কী মঙ্গল হবে? কিছু ভুঁইফোড় রাজনীতিবিদের কেরিয়ার হতে পারে মাত্র। আগে কিছু ছিল না তাই এখন করে কম্মে খাচ্ছেন। কিন্তু জনগণের জন্য কিছু হবে কি?

> অনেকে ঠাট্টা করে বলেন বাঙালি নাকি সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে স্থায়িত্বের প্রতি যত্নবান। ১৯৪৭-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস। তার পর আবার ১৯৭৭-২০১১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকালীন একটি শাসন।

গত তিন দশকে উত্তর ভারতে চাষিদের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংকট চলছে। আজকের কৃষক আন্দোলন তার একটি প্রতিফলন। উত্তর ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গে তাই অনেক মানুষ কাজের সন্ধানে আসছেন। কিন্তু সকলকে কাজ দেওয়া এই রাজ্যে সম্ভব নয়। ব্যক্তি, রাষ্ট্র, রাজ্য, মত এবং মতাদর্শ— সকলেরই তো সীমাবদ্ধতা আছে। উল্টো দিকে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশকে দেখুন। এই কোভিড পরিস্থিতিতেও তারা অনেক ভালো ভাবে তাদের অর্থনীতিকে সামলেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু উটকো সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করতে তারা পিছুপা হচ্ছে না। বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপরে যে নিপীড়ন হয়েছে তা নিন্দনীয়। নিন্দা করার ভাষা পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু তা বলে আমাদের রাজ্যে তৃণমূল থেকে দলবদল করা নেতা থেকে শুরু করে পুরাতন ঘরানার বিজেপি নেতারা ধর্মের নামে লোক খেপিয়ে বেড়াবেন?

পুরনো ধরনের রাজনীতি ছাড়ুন। বিজেপি যদি নতুন ভারত গড়তে চায় তা হলে নতুন আখ্যান গড়তে শিখুক। সেই কবে থেকে একই ধরনের বক্তব্য শুনে যাচ্ছে মানুষ। 'মুম্বই মেরি জান'-এর (২০০৮) একটি ডায়লগ মনে পড়ে যাচ্ছে। পরেশ রাওয়াল একটি সাধারণ হাবিলদারের ভূমিকায় কথাটি বলেছিলেন। চরিত্রের নাম তুকারাম পাতিল। তিনি হিন্দু। আর তার পাশে আদম শেখ, মুসলমান। দুজনেই মুম্বই পুলিশের হাবিলদার। তুকারাম পাতিল বলছে, ধরুন হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে ধাক্কা মারামারি চলছে বহু দিন ধরে। ছোটবেলা থেকে সেই ধাক্কাধাক্কি চলছে। হাবিলদারের অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি চলছে। এই ধাক্কাধাক্কি মারার লম্বা চেন বন্ধ হওয়া উচিত। আমাদের রাজ্য ও দেশের সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন প্রবীণ রাজনীতিবিদরা কি সেই একই ধরনের ধাক্কাধাক্কির রাজনীতির মধ্যেই থেকে যাবেন? অনেকের তো অবসর গ্রহণ করার সময় হয়ে এল। তারা কি এখনও সেই হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি করে যাবেন? তাদের দলের নতুন রাজনীতিবিদদেরও একই রকম শিক্ষা দিয়ে যাবেন? আর কত দিন ধরে একে অপরের প্রতি ঘৃণা চলবে?

কয়েক দিন আগে বিএসএফ উত্তরবঙ্গে এক গরু পাচারকারীকে মারতে গিয়ে আমাদের দেশের এক নাগরিককে মেরে ফেলেছে। অন্তত খবরের কাগজে তাই প্রকাশিত হয়েছে। বিএসএফ-কে যদি আরও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা হলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হয়। তাতে দেশের সাধারণ গরিব মানুষ কিছু কাজ পায়। এহেন সরকারি প্রকল্প তো অনেক আছে। একশো দিনের কাজের কথাই ধরুন। তাতে অধিক জনসংখ্যার মানুষের দেশ ও রাজ্যে আরও কিছু মানুষ কাজ পাবে। বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশের পথ যেমন বন্ধ করতে হবে তেমনই ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে হবে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে। শুধু কি প্রযুক্তির মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয়?

বিএসএফ-এর এক্তিয়ার বৃদ্ধির বিরোধিতা করে বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে। শাসক দলের মুখপত্র অনুযায়ী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ১২১ আর বিরুদ্ধে ৬৩। কিন্তু প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আরও অন্তত ১০০ বেশি ভোট পড়া উচিত ছিল। সমস্ত বিধায়করা কেন যে এলেন না কে জানে? কেন্দ্র যদি রাজ্যের বিষয়ে এত বেশি নাক গলায় তা হলে তো শাসক দলের আরও বেশি সতর্ক থাকা উচিত।

এই শাসনপর্বে পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি আসছে। পুঁজি আসতে দিন। লোকে কাজ পাক। সাধারণ বাঙালির পুঁজি কম। তাই বাঙালি ঝুঁকি নেয় না। মান-অভিমান ছাড়ুন। নতুন রাস্তা হবে, নতুন ব্রিজ হবে, নতুন কারখানা হবে। বন্ধ-কারখানায় নতুন বাড়ি হবে বা অন্য কোনও কারখানা হবে। অলি গলি পরিষ্কার-পরিছন্ন করে, তার বিস্তৃতি ঘটিয়ে অন্য রাস্তার সঙ্গে আরেক রাস্তার যোগাযোগ হবে। শহর-গ্রাম-রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের জন্য জমি লাগবে। কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন হবে। সিঙ্গুরে বাঙালি রাজনীতিবিদরা যে ভুল করেছিলেন, সেই ভুল যেন আগামী দিনে আর না হয়। উন্নয়নের কাজে বিরোধিতা বঙ্গীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি স্থায়ী উপাদানে যেন পরিণত না হয়।

লেখক সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

গান দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়!

ই ন্ডি প প

ইন্দ্রজিৎ হাজরা

ভোজনরসিকরা মুখ খুলে খায়। আমি কান খুলে গান-বাজনা শুনি। কাজের শেষে — বিশেষত পরের দিন ছুটি থাকে বলে শুক্রবার রাত্রে — আমি বেপরোয়া ভাবে নানান যন্ত্রে গান বাজাই, অনেক সময় দুটো যন্ত্রে একই সঙ্গে, গানের ভিডিও বা গানের কথা একটায় দেখি আর অন্যটায় গানটা শুনি, দুটো ইন্দ্রিয়কে খুশি রেখে। তবে পুরোপুরি বেপরোয়া ভাবে যে গান শুনি তা ঠিক নয়। বাড়ির আর কেউ ঘুমোনোর চেষ্টা করলে বা মগজকামে ব্যস্ত থাকলে কানে হেডফোন দিয়েই শুনি।

এক কালে গান শোনার সঙ্গে গান শোনানোরও আনন্দ ভোগ করতাম সাউন্ড সিস্টেমটা প্রচণ্ড জোরে চালিয়ে। আমি যে গান শুনে লোমহর্ষক সুখ পাচ্ছি, পাড়ার নানান লোকজনের ওটা কানে গেলে আর এক রকম সন্তোষ পেতাম বটে এক উদ্যমী ধর্মপ্রচারকের মতো। এখন হাতে এসেছে আর এক অস্ত্র যার নাগাল আরও বেশি — ফেসবুক। যে সব গান গীতমালার মতো বেছে, গেঁথে শুনি, প্রায় সবই চড়িয়ে দিই ফেসবুকের বিস্তৃত জলসাঘরে। ওই প্রাঙ্গণে আমার প্রিয় গান ছড়ানো কালে বুঝলাম যে আমার গানের স্বাদ অনুযায়ী অনেকে আমায় মাপে — স্বভাব, চরিত্র, রুচি, ইত্যাদি। এটা বুঝে যতটা মজার লেগেছে, একটু ঘাবড়েও গেছি বটে।

গানের মধ্যে আমি সব থেকে ঘন ঘন শুনি রক সংগীত। এর মধ্যে আমার বড্ড প্রিয় বেশ কয়েক '৭০, '৮০,'৯০ দশকের ব্যান্ড আর গায়ক — যেমন নির্ভানা, ইগি পপ, দ্য রোলিং স্টোনস, দ্য সেক্স পিস্টলস, জয় ডিভিশন, দ্য স্মিথস, বব ডিলান, দ্য বিটলস, এলিস ইন চেন্স— যে রাতে যে র'ম মেজাজ সেই বুঝে শুনি, যেন গানের চৌবাচ্চায় বার বার রাতভর ডুব মেরে। এ ছাড়া আছে হিন্দি সিনেমার গান — কিশোরের 'মুকদ্দর কা সিকান্দর', গীতা দত্তের 'ওয়ক্ত নে কিয়া', ডাব শর্মা আর ডিভাইন-এর সংগীত আর রণবীর সিংয়ের গাওয়া 'আপনা টাইম আয়েগা', হিমেশ রেশেমিয়ার রচিত আর বিনীত সিং আর আমান ত্রিখার 'হুকা বার', এ আর রহমান রচিত মনীশ চওহান-এর গাওয়া 'মাসাক্কালি'...

বাংলা গান খুবই অল্প শুনি। আবেগের দিক থেকে কম টান লাগে। যেগুলো শুনি সেগুলো বেশির ভাগই রাত যখন অতটা হয়নি আর যখন আমি একা বসে নেই — ডিজে বাপনের প্রায় সব গান, রবি ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' (যেটা দিল্লিতে বসে আরও বেশি শুনি), কিশোর কুমারের 'কারো কেউ নই কো আমি'... গানের দোষ অবশ্যই নয়। আসলে আমার ব্যক্তিগত ইতিহাস অনুযায়ী গড়ে ওঠার বছরগুলোয় এত রক মিউজিক শুনেছি যে আমার স্বাদই 'ওই দিকে' চলে গেছিল অনেক আগেই। আর কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না।

উদয় দেব

৯০-৯৫% ইংরেজি রক মিউজিকই শুনি আর শোনাই। কেন শুনি তা বলা মুশকিল। তবে 'ইংরেজি গান বাজনা' মহাসাগরের সব কিছু মোটেও শুনি না। ভালো রক সংগীত শুনে আমার রুদ্র, শৃঙ্গার, করুণ, ভয়ানক আর হাস্য রস ফুটন্ত জলের মতো সব থেকে বেশি টগবগ করে ওঠে। হিন্দি আর বাংলা গান শুনে প্রধানত বীর, শৃঙ্গার আর করুণ রস জাগে।

তবে এ সব আঁতলামি করে লাভ নেই। এটা আমার কানের অভিজ্ঞতা — ভালো-খারাপ, উপযুক্ত-অযোগ্য, সাংস্কৃতিক-অপসাংস্কৃতিক কিচ্ছু যায় আসে না। কানে যা ভালো লাগে ভালো লাগে। যা শুনে অকম্পিত রয়ে যাই সেগুলো পড়ে থাকে। আর যা ভালো লাগে না সে গানের জলাঞ্জলি করি, তা সে যতই সাংস্কৃতিক মতানুসারে আমার ভালো লাগার কথা হোক না কেন।

আমার পটল ভাজার প্রীতি, দিল্লির প্রতি ভালোবাসা, সাহেবিপনার প্রতি বিকর্ষণ, বাংলা, ইংরেজি, চেক, ফরাসি, জার্মান ইত্যাদি সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ, টাবাস্কো আর টমেটো সসের প্রতি দুর্বলতা, বাংলায় গালাগাল দেওয়ার আনন্দ, ইংরেজি ভাষায় গালাগাল দেওয়ার আর এক রকম মজা, মোহনবাগানের প্রতি আনুগত্য— এই সবের সঙ্গে আমার রক সঙ্গীতকে ভালোবাসার যে কোনও সমাজতাত্ত্বিক কারণ হতে পারে, হবেও বা। আমার জানার বা জানানোর খুব একটা দরকার নেই।

তবে অবাক হই বটে যখন কেউ ফেসবুকের গর্ত থেকে মাথা তুলে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'এ কি! তুমি হিন্দি গান শোনো?' বা 'সে কি! তুমি এখানে রক গান না চালিয়ে পপ গান চালালে?' বা 'ইস্, তুমি ওই সব গান ছেড়ে 'বড় লোকের বেটি লোক', তাও আবার বাদশার রিমিক্স গানটা শুনছো!' যেন আমার এক প্রকারের চরিত্র বলে এক প্রকারের গানের লিস্টের বাইরে গেলেই ডাক্তার দেখাতে হবে — বা আরও খারাপ, আমি লোক দেখানোর জন্যে বছরে দু'বার আমার প্রিয় 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' চালাই আর শুনি আর শোনাই।

ঠিক কথা, রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেই আমার বদহজম হয়। অনেক গানই কেউ চালালে বা গাইলে আমি ফোন আসছে ভান করে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। কিন্তু সেই আমারই 'আমার সোনার বাংলা' শুনলেই লোম খাড়া হয়ে যায় — যেন দ্য রোলিং স্টোনস-এর 'মুনলাইট মাইল' শুনছি।

তাই বলি, কারও গানের লিস্টি দেখে তার পুরোপুরি মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইলিং করবেন না। ভজন শুনে লোক দাঙ্গা করতেই পারে, ক্লিফ রিচার্ডের গানে নাচতে নাচতে পৈতে ছুঁয়ে ব্রাহ্মণের অভিশাপ দিতেই পারে। শ্যামাসঙ্গীত ভালোবেসেও পাঙ্ক রকের ভক্ত হতে পারে। শুধু এক প্রকারের গান শোনা বড্ড সংকীর্ণ। গানের স্রোতে না ডুবতে পারলে, কান দিয়ে সাঁতরাতে শিখুন।

ঝাঁ কি দ র্শ ন

স প্তা হা ন্তি ক

ডিজনির লোগোর বিবর্তন। উপলক্ষ্য প্রথম ছবি রিলিজ। ১৮ নভেম্বর ১৯২৮

Walt Disney
■ ১৯৩৭ - ১৯৪৮

Walt Disney
■ ১৯৪৮ - ১৯৭৯

Walt Disney Productions
■ ১৯৭২ - ১৯৮৩

Walt Disney Pictures
■ ১৯৮৩ - ১৯৮৫

Walt Disney Pictures
■ ১৯৮৫ - ২০০৬

Walt Disney Pictures
■ ২০০৬ - ২০১১

Disney
■ ২০১১ থেকে এখনও অবধি

সংকলন: অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়; সূত্র: ইন.প্রিন্টারেস্ট